একুশের চেতনা এবং আমাদের এনজিও/সিএসওগুলোর আত্মসম্মানবোধ

একুশ এবং মহান ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে সাহসী হতে শেখায়, ঔপনিবেশিক ও জান্তা শক্তিগুলোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায়। একুশের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেই আমরা পেয়েছি একটি মুক্ত-স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ। প্রিয় এই বাংলাদেশ এখন আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নেই, এটি বরং সম্পদে পরিপূর্ণ একটি বিস্ময়কর ঝুড়ি। আমাদের মানুষ আমাদের অন্যতম সম্পদ। কিন্তু আমরা, দেশের সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও) / এনজিও কর্মীরা কি সেই সাহস ও চেতনা ধারণ করতে পারছি? গ্র্যান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতি, চার্টার ফর চেঞ্জ, ও কার্যকর উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে মুক্তি ও লড়াইয়ের একই ধরনের চেতনা রয়েছে, যা স্থানীয় সিএসও/এনজিও এবং তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন ঔপনিবেশিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

বিভিন্ন সভায়-অনুষ্ঠানে স্থানীয় সিএসও/এনজিও র কিছু নেতা বা কর্মীবৃন্দ যেভাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার চাটুকারিতা শুরু করেন, যেভাবে তাঁরা বিদেশী সহযোগীদের সন্তুষ্ট করতে নিজেদেরকে খাটো করে ফেলেন-তা দেখে আমি যারপরনাই অপমানিত বোধ করি। এ ধরনের চাটুকারিতার খুব সাধারণ কিছু নমুনা আছে, যেমন: বাংলাদেশী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিদেশি সংস্থার লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, "আপনি যা বলেছেন, এরকম ভালো কথা আমি আগে কখনও শুনিনি", "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার খারাপ লাগলেও এটা সত্য যে, আমাদের পর্যাপ্ত সক্ষমতা-দক্ষতা নেই, আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে আপনার সহযোগিতা খুবই দরকার!', 'আপনাদের প্রতি আমি এতটাই নিবেদিত ছিলাম যে, সংস্থার পরিচালক হিসেবে নয়, বরং প্রকল্পটি সফল করতে আমি মাঠকর্মীর মতো কাজ করেছি!' বাংলাদেশী এনজিও-সিএসও-র লোকজন মনে করে, এ ধরনের চাটুকারিতা তাদেরকে প্রচুর অর্থ-সহায়তা বা তহবিল এনে দেবে!

এই অবস্থাটাকে আমি উন্নয়ন সহায়তার ঔপনেবিশীকরণের উৎকৃষ্ট প্রবণতা হিসেবে অভিহিত করতে চাই। ব্রিটিশদের দ্বারা দুইশত বছর শাসিত হয়ে এই উপমহাদেশের মানুষজনের মানসিকভাবে বড্ড ক্ষতি হয়ে গেছে, মানসিকভাবে আমরা চিরস্থায়ী এক ধরনের হীনমন্যতায় ভীষণ রকম মগ্ন। ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের অনেক নেতৃবৃন্দকেই দেখা গেছে নিজেদেরকে ব্রিটিশ রাজের দাস হিসেবে পরিচিত করে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন! আমরা এখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রায় একই রকম আচরণ করছি। ইতিহাস প্রমাণ করে, এধরনের অবস্থা চিরস্থায়ী থাকবে না।

আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, উন্নয়ন যাত্রায় আমরা সমান অংশীদার এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা পারস্পরিকভাবে বিনিময় করে নিতে পারি, কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এই ধরনের বিশ্বাস ধারণ করেন। মূলত উন্নয়ন সহায়তার ঔপনিবেশীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ, উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যকার দাতা-গ্রহীতার তথাকথিত সম্পর্কের বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা উল্লেখিত আন্তর্জাতিক দলিলগুলো আমাদের দেয়। এটিই স্বনির্ভরতা, সার্বভৌমত্ব এবং স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের সঠিক পথ। সমালোচনাকেও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, কারণ গঠনমূলক সমালোচনা ও সচেতনতা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিশ্চিত করার দিকে নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সব ক্ষেত্রেই আমাদের সব সময় 'জ্বি হুজুর, জ্বি হুজুর' বলা সমীচীন নয়, অথচ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে এবং জাতীয় পর্যায়ে এমনটাই হচ্ছে ইদানিং। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে অবশ্যই স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য প্রতিযোগিতায় নীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে এনজিও / সিএসওকে অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে। অন্যথায় এনজিও / সিএসও-গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অপ্রতুল হয়ে যাবে, এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হবেনা।

আমাদের বৃত্তের বাইরে গিয়ে চিন্তা করা দরকার। সবসময় দালানকোঠার দরকার হয় না, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ছোটখাট কয়েকটি যন্ত্র দিয়েই একজন ব্যক্তি মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেন, ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন এবং মানুষের অধিকার আদায়ে এবং মানবিক সংকটে কার্যকর সাড়া দিতে পারেন। আপনার সর্বদা বিদেশী তহবিলের প্রয়োজন হয় না - আপনি নিজস্ব স্থানীয় উৎস তৈরি করতে পারেন। ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা বিদেশিদের কেন বাংলা শিখতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে আমাদের দেশে কাজ করার সময় বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বলি না? আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এবং স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের জন্য কেন আমরা বিদেশি সংস্থাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিতে বলি না? তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে কেন আমরা বলি না যে, তাদের সংস্কৃতিতে যা অনেক ‘প্রয়োজনীয়’ বিষয়, আমাদের সংস্কৃতিতে সেগুলোই বিলাসিতা হিসেবে বিবেচিত ? আমাদের উচিত স্থানীয় পর্যায়ে হিসেবি এবং দায়বদ্ধ হওয়া। আমাদের বলা উচিত যে, সব সমস্যা সামাধানের একই সূত্র দিয়ে হয় না। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানবতাবাদ, স্ব-উদ্যোগী সমাজ গঠন, জবাবদিহিতা, টেকসই এবং সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কখনোই উপযুক্ত নয়, আমাদেরকে দেশজুড়ে শত ফুলকে ফুটতে দিতে হবে।

রেজাউল করিম চৌধুরী, ১৬ ফেব্রুয়ার ২০২১